ARCHIVE থেকে
AUGUST
2014

অগাস্ট ২, ২০১৪

আমাদের জাতীয় ধর্ম কি?
কি সেই এমন অমোঘ সর্বজনপ্রিয় নাক খোঁটা, যা না থাকলে সারাদিন পেট গুরগুর? সেটি হল আহত হওয়া, সাদা বাংলায় to get offended.
সাতসকালের চা থেকে রাত্রিবেলার মিঠে পান পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে আমাদের অফেন্ডেড হবার হাজারো উপকরণ। ধরুন একজন চক্ষুস্মান মানুষের কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার অভিজ্ঞতা একজন দৃষ্টিহীন মানুষের কাছে অফেন্সিভ। পাশের বাড়ির মেয়েটার 'বেজাতে' বিয়ে করা আমাদের কাছে অফেন্সিভ। খোঁড়াকে খোঁড়া বলা আমাদের কাছে অফেন্সিভ, খোঁড়াকে খোঁড়া না বলা আমাদের কাছে অফেন্সিভ। পুরুষপ্রধান গল্প নারীদের কাছে অফেন্সিভ, নারীপ্রধান গল্প পুরুষের কাছে অফেন্সিভ। একজন সমকামী মানুষের সমকামীতা অসমকামীদের কাছে বেজায় অফেন্সিভ। একজন অসমকামী মানুষের অসমকামীতা সমকামী মানুষের কাছে ততোধিক অফেন্সিভ। এই যে ডেস্কটপের কি বোর্ডে টাইপ করে লিখছি, তা নিশ্চয়ই ল্যাপটপ ব্যবহারকারীদের প্রবল অফেন্ড করছে। তেমন ভেবে দেখতে গেলে আপনার প্রতিটি কাজকর্ম কোন না কোন মানুষের কাছে গুরুতর

অফেন্সিভ। আরে, সেইজন্যই তো আদালত আর সেন্সরবোর্ড।
খবরের কাগজের পাতাজোড়া নগ্ন(?) অভিনেতার বিজ্ঞাপন তাই কারুকে আলবাৎ অফেন্ড করেছে এবং তিনি আদালতের দ্বারস্থ। মুম্বাইকে বোম্বে বলায় আহত হয়ে সিনেমা হল ভাংচুর করেছি আমরাই। ভারতীয় সিনেমায় তথ্যের ভুলে আহত হয়ে IMDB তে তাগত দেখিয়েছি। বইয়ের দুটো পাতা তেমন না পড়েই আহত হয়ে লেখিকাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়েছি। ঘাড়ধাক্কা দিয়েছি নগ্ন দেবীর ছবি আঁকা চিত্রকরকে, কোনার্ক কিংবা ইলোরা না বুঝেই।
আশা করা যায়, আমাদের পোস্টেও কোন না কোন মানুষ আহত হবেন, আগেও হয়েছেন। তেমন না পোষালে ফেসবুক তো আনলাইক বাটন দিয়েইছে। আমরা একটু আহত হব ঠিকই, তবে আমরা মারতেও জানি নে, কাটতেও জানিনে। বিধাতার প্রসাদে আমরা কেবল হাসতে জানি।
ভালো থাকবেন বন্ধুরা।

অগাস্ট ৬, ২০১৪

মেট্রোয় নিয়মিত যাতায়াত করার প্ল্যান রয়েছে?
কিছুদিনের মধ্যাই টের পাবেন যাতায়াতের সবচেয়ে দরকারী অভ্যেস হল ট্রেনে চড়েই সিটে যারা বসে আছেন তাদের ওপর চোখ বুলিয়ে আন্দাজ করে নেওয়া কার আগে নামার চান্স সবচেয়ে বেশী। বেশভূষা, আর্থিক অবস্থা, হাতের ব্যাগ, কথাবার্তা ইত্যাদি হাজারো এলিমেন্টকে মেপে ফেলুদাসুলভ অবসারভেশনে প্রাণপণ গেস করা ডান দিকের তিন নম্বর ব্যক্তিটি আগে নামবেন না বাঁ দিকের পাঁচ নম্বর।
বেশ কিছুদিন যাতায়াতের সুবাদে তৈরী একটা মোটামুটি ফর্মুলা বানিয়ে দেওয়া গেল, যারা জানেন একবার ঝালিয়ে নিন, যারা জানেন না অবিলম্বে মুখস্ত করুন। তবে ফেল করলে কর্তৃপক্ষ দায়ী নহে। তবে শুনুন, খুব মন দিয়ে শুনুন।
বেলগাছিয়া শ্যামবাজার শোভাবাজারে লোক নামার চান্স খুব কম। গেস শুরু গিরিশ পার্ক থেকে।
মাঝবয়েসী মহিলা উইথ বাচ্চা, মেডিকেল রিপোর্ট হাতে বৃদ্ধ- গিরীশ পার্ক
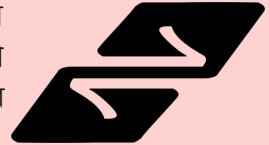
পিঠে ব্যাগ কলেজ পড়ুয়া - মহাত্মা গান্ধী রোড
সরকারী কর্মচারী (হাতে লেদার ব্যাগ/ফাইল), স্বাস্থ্যবান চেহারা (লালবাজার)- সেন্ট্রাল
গলায় সোনার চেন (ব্যবসায়ী), নিম্নবিত্ত হিন্দিভাষী, শুধু ল্যাপটপ হাতে ছোকরা - চাঁদনী চক
সেন্ট্রাল-চাঁদনী চক ঘরানা, শপিং-উৎসাহী, ডেটিং-উদ্দেশী যুবক-যুবতী- এসপ্ল্যানেড
অভিজাত ও ইংলিশভাষী বং, স্যুটেড-বুটেড টাই পরা বেসরকারী কর্মচারী (হাতে ট্যাব বা বড় স্মার্টফোন), কিছু ছাত্র-ছাত্রী - পার্ক স্ট্রীট
আরো কিছু বেসরকারী কর্মচারী, ঢ্যাঙা নাইজেরিয়ান - ময়দান
ঝাঁকড়া চুল, ঢোলা পাঞ্জাবী ছেঁড়া জিন্স আঁতেল, ব্যাগে হাওড়ার অ্যাড্রেস লেখা লোকজন - রবীন্দ্র সদন
তারপর থেকে সব আনতাবড়ি, কোন গেসিং এর চান্সই নেই।
আর এরপরেও যদি আপনি সিট না পান, তারপরে যান যেথায় খুশি, জ্বালিও নাকো মোরে।

অগাস্ট ৮, ২০১৪

যীশুঠাকুরের আপন দেশে, আইন কানুন সর্বনেশে!
পার্ক স্ট্রীট রাস্তাটা এমনিতে বেশ সুন্দর, চারদিকে নামজাদা হোটেল, দোকানপাট, একদিন ঢুকবো-ঢুকবো আশা। কিছুদূর এগোলে আপনি দেখতে পাবেন একটি নিরামিষ থানা, সামনে পুলিশ মোতায়েন। আর তার ঠিক বিপরীতে পুলিশি ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ, অর্থাৎ কিনা জেল। যার পোশাকি নাম সন্ত জেভিয়ায়ের মহাবিদ্যালয়।

NIHIL ULTRA

'ওয়ান্স এ জ্যাভেরিয়ান, অলওয়েজ এ জ্যাভেরিয়ান' প্রথম প্রথম এই নির্বিষ কথাটি শুনে আপনার বেশ ভালোই লাগবে। কিন্তু কিছুদিন পরই মনে হতে লাগবে 'They sent you here for life, and that is exactly what they take', The Shawshank Redemption সিনেমার সেই অমোঘ উক্তিটিরই মেটাফোর এই মোটো। বাঙালীরা নাকি মোটে ডিসিপ্লিনড নয়, এই নিন্দার মুখে ছাই দিয়ে নিয়মে নিয়মে নিয়মিত এই জেলখানাটি। ছাত্ররা এখানে শিক্ষিত হতে আসে না, আসে ট্রেনড হতে। শেখে, গলা থেকে আই কার্ড খোলা জামিন অযোগ্য অপরাধ। ফতোয়া কোথায়? এর নামই তো আধুনিকতা! রামকৃষ্ণ

মিশন কিংবা তালিবানি শাসনের চেয়ে দশগুণ বেশী ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেও দিব্যি মিডিয়া আড়ালে এই জেলখানাটি। ছাত্ররা জানে, এখানে সর্বপ্রহর ল্যাবের অসহায় ইঁদুরের মত সর্বত্র তুমি সিসি ক্যামেরার আওতায়। একটু বেগড়বাঁই করেছ কি? অবিলম্বে ফাইন। পুরুষ ছাত্ররা শেখে, গোল গলা গেঞ্জি বা কোনরকম ভালোমন্দ জিনিস লেখা পোশাক পরে কলেজে আসা যাবে না। শেখে না নিয়মটা কেন? কোন শালীনতার বাধায়? শেখে সিঁড়িতে না বসতে, অনুমতি ছাড়া মাঠে না খেলতে, খাবার নিয়ে না উঠতে, ক্যান্টিনে মোবাইল ব্যবহার না করতে, বাইরের ডবল পয়সায় খাবার কিনতে, লাইব্রেরীতে বন্ধুকে অঙ্ক না দেখিয়ে দিতে এবং কোন নিয়মের কোন বিরোধীতা না করতে। কলেজে রাজনীতি নেই ভালো কথা, ছাত্র ইউনিয়ন একটি আছে। তাদের কোন প্রতিবাদও থাকতে নেই, থাকতে আছে শুধু বাৎসরিক ফেস্ট মচানো। কলেজ জীবন যে একটি বড় হবার জায়গা, একটু স্বাধীনতা পাওয়ার জায়গা গ্যারান্টিসহ ভুলিয়ে ছাড়বেই ছাড়বে

অনেকেরই বিশ্বাস হবার কথা নেই। দিল্লিকা লাড্ডু না খাওয়া জনগণের পস্তানোটাই

স্বাভাবিক। সদ্যযৌবনা ছাত্র-ছাত্রীদের সাইজ করে দেবার আদর্শ এই স্বয়ংশাসিত জেলখানা। ৩০, পার্ক স্ট্রীটের আড়ালে যে কি চলে, তা আর কেউ জানতে পারে না কখনো। শুধু সেই যান্ত্রিক ছেলেপুলেগুলোর পেট টিপলে শুকনো পুঁথির পাতা খসখস গজগজ করে ওঠে।

আমাদের কথা বিশ্বাস করতে হবে না, যন্ত্র তৈরীর পাঠশালাটিতে পা বাড়ানোর আগে একবার ভালো করে খোঁজ নিন।

অগাস্ট ১০, ২০১৪

(এবং এর জন্য কিবোর্ড ধরলেন সৌপর্ণ অধিকারী , লেখক বর্তমানে ফ্লোরিডা স্টেট ইউনিভার্সিটির ডক্টরাল স্টুডেন্ট)
রাগ-বেহাগ, ত্রিতালঃ
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, টালাহাসি, ফ্লোরিডা, সন্ধে সাড়ে সাতটা --- একটু আগে বড় বড় ফোঁটায় এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে... এয়ারকন্ডিশনড অ্যাপার্টমেন্টের দোতলার ঘর থেকে বেরিয়ে সামনের ঘাসে দাঁড়িয়ে একটু বৃষ্টিতে ভিজে এলাম...
রুমমেট, বলা ভালো অ্যাপার্টমেন্টমেট অর্চিষ্মানদা... অর্চিষ্মান ঘোষ... বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজে আমার সিনিয়র ছিল... পারিবারিক সূত্রেই খানিকটা হয়তো পিয়ানো বাজানোর গুণটা অর্জন করেছে... শনিবার, উইকএন্ডের প্রথম দিনটা মোটামুটি পিয়ানো বাজালো গোটা দুপুরটা... বাইরের ঘরে বসে নাইলন স্ট্রিং-এর গিটারটা নিয়ে বৃথাই সঙ্গত দেবার চেষ্টা করছিলাম...

কী একটা কম্পোজিশন বাজাতে বাজাতে হঠাত নি, সা, গা, মা, পা, নি র (অর্থাৎ বেহাগ) মারাত্মক কম্বিনেশন... আলাপ...
প্রবহণ, মানে আমার বন্ধু প্রবহণ চক্রবর্তী, নিউরোবায়োলজির গবেষক, বছর দেড়েক আগে কলকাতার এক শীতের রাত্রে ফোনের দীর্ঘ আলাপে বলেছিল মস্তিষ্কের আবেগের বহিঃপ্রকাশের পেছনে চাবিগুলোর কথা...
ভুলো স্বভাব চিরকালই... স্বাভাবিকভাবেই ভুলে মেরে দিয়েছিলাম... তালকানা স্বভাবের জেরে সবসময়েই যেখানে সেখানে চাবি খুলে ভাঁড়ার উজাড় করে দিয়েছি হয়তো... পছন্দ হয়নি অনেকেরই, দূরে সরে গেছে...
সবাই সবটা নিতে পারে না...
সা, নি, পা, মা, পা, গা, মা, পা, নি, পা, নি, র্সা, র্গা, রে, র্সা... বিস্তারে প্রবেশ...
বিসমিল্লাহ্ র পাগলা সানাই জাগিয়ে রাখতো সুমনকে... অপেক্ষায়, সারারাত...
রাবীন্দ্রিক ভাষায়, ঠাসবুনোটের দিনের মাঝে ফাঁকের মত দম ফেলতে চাইছি...
যাকগে, স্রোতের থেকে সরে যাচ্ছি... বন্দিশে ফেরা যাক...

গা, মা, পা, নি, র্সা, র্সা, নি, ধা, পা... (১৬মাত্রা, ত্রিতাল)
বন্ধুদের, যারা বিদেশে গেছে, প্রায় প্রত্যেকেই (এমনকি যারা দেশের ভেতরেও অন্যত্র কাজে ব্যস্ত) কখনো না কখনো নিজের শহর, পরিবেশ, সন্ধে, দুপুর, রাত্রি, পাগলামি, ঘামের গন্ধ, পোড়া ডিজেলের নিঃশ্বাসের উদ্দেশ্যে বক্তব্য পেশ করেছে...করবো না ঠিক করেছিলাম... এয়ারপোর্টে যাবার আগেও ওইজন্য একটুকরো ধরতাই ছাড়া আর কিছু রাখিনি...
নিসা, গামা, পামা, পাগা, মাপা, নিপা, মাপা, গামা, গামা, পানি, নিপা, মাগা, মাগা, নিসা, গামা, গামা, পা-... (একদম ৬৪ মাত্রা...)
অর্থাৎ তান... কলকাতা মানুষ করেছে দেড় কোটি মানুষকে... আমিও ব্যতিক্রম হতে পারি কি? (যতই চেষ্টা করি)...
চেষ্টার ফল কী?... বড় বড় ফোঁটায় নিম্নচাপের বৃষ্টি... ভিজিয়েছে অনেককেই... অনেকের কাছেই বিরক্তিকর হয়ে গেছে (তাতে যদিও কিছু এসে-যায়নি)... অনেকের কাছে হয়নি... বৃষ্টির মেঘ হাওয়ার দাপটে নিজে থেকেই সরে গেছে... খাপছাড়া সবই...

মস্তিষ্কের চাবির কাজ করে গান... আরো বৈজ্ঞানিকভাবে বললে সুর... কিছু কম্পাঙ্কের কম্বিনেশন... নিউরোসায়েন্স ভালো করে জানি না... কাজেই কোথায় কাজ করে বলতে পারবো না...
আনন্দমাইড বেশি বেরোয়? বিডিএনএফ? সেরোটোনিন? ডোপামাইন? জানি না...
পিএইচডির শেষেও কিছু জানবো, আশা রাখি না...
একাকীত্বের ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ছে... বরফির (আসল বরফি, গুগাবাবা র) ওষুধের মত...
কাজেই রাস্তায় কানে হেডফোন গুঁজে ভাবনা নিয়ে একা রাস্তা পেরোনোই সম্বল...
ছাই, হলুদ, আর ওক গাছের সবুজ মিলে জানালার পাশে ভ্যান গগের ক্যানভাস...
গা, মা, পা, নি, র্সা... (তেহাই)...
সন্ধে নামছে আটলান্টিকের পশ্চিম পাড়ে...
পুনশ্চঃ এইসব সারেগামা ভালো না লাগলে গলায় বা হারমোনিয়ামে বা পিয়ানোয় বা গিটারে গেয়ে বা বাজিয়ে দেখতে পারেন... খারাপ লাগবে না আশা করি...

অগাস্ট ১৫, ২০১৪

'এরই মধ্যে এই গরুর গাড়ির দেশে বিমানে চেপে হুড়মুড়িয়ে চলে এল...... স্বাধীনতা!' সঙ্গে রক্তদান শিবির এল, ফুটবল টুর্নামেন্ট এল, দুরদর্শনে প্যারেড এল, মাংসের দোকানের লাইন এল, জি বাংলায় সব্যসাচী এল। সৎ জনপ্রতিনিধির পান চিবোনো ভাষণ এল খানিক। ভগৎ সিং ক্ষুদিরামের গলায় মড়ার মালা এল, প্রতিবারের মত। টিফিন হাতে কচিকাঁচারা দৌড় লাগালো বাড়ির দিকে। ফেসবুক হোয়াটসয়্যাপে স্ট্যাটাস দিয়ে স্বাধীন হলে তরুণ-তরুণী। ফরেন লিকার শপ বন্ধ আর ফ্রিজে স্টক নেই বলে মুষড়ে পড়লেন অনেকেই। নেতাজী এবছরও ফিরলেন না। আর আমরা অ্যান্টি কথাবার্তা বলে চাড্ডি লাইক বাগিয়ে বগল বাজালাম।

ও হ্যাঁ, আস্তাকুঁড়ের পাশে কন্ডোমের ছেঁড়া প্যাকেটের সঙ্গে কিছু তিরঙ্গাও পাওয়া গেল। অবশ্য সেগুলো নিছকই গুটখার প্যাকেট।

অগাস্ট ১৭, ২০১৪

'আমরা কজন' ক্লাবের পুজোটা হত মাঠের উত্তর কোণে। এই অঞ্চলের বেশ বড় পুজো হওয়ায় লোকসমাগম ছিল ভালোই। প্যান্ডেলের গেটের উল্টো ফুটে বুড়োদা প্রতিবার রোলের দোকান দিত। আর তার ঠিক পাশেই বসত একটি সন্দেহজনক দোকান। লাল সালুতে ঢাকা স্টলে কয়েকজন গম্ভীর চেহারার ধুতি, পাঞ্জাবী পরা বুড়ো লোক গুলতানি মারছে। আর সামনে, রোল নয়, কাঁচের চুড়ি নয়, জিলিপি-গজা বা কোল্ড ড্রিঙ্কস নয়, একগুচ্ছ বই সাজানো। ওপরের থার্মোকলের লেখাটা বানান করে পড়তাম মা-র-ক-স -বা-দী সা-হি-ত্য প-ড়ু-ন ও প-ড়া-ন। ঠিক মানে বোঝা যেত না। মার্কসবাদী মানে? ইস্কুলের মার্কসের কিছু?

আমি তখন সবে ঈশপ-বোধোদয় শেষ করে ঠাকুরমার ঝুলিতে মশগুল। একদিন ক্যাপ ফাটানোর ফাঁকে কৌতূহলে দেখে আসলাম কি ওই বইগুলো? বেশীরভাগ বইতেই একটা দাড়িওলা লোকের ছবি দেওয়া আর কি কি সব কঠিন যুক্তাক্ষরের নাম। আর একপাশে কিছু বই লাল-কালো বাচ্চাদের ছবি দেওয়া। নাম 'রুশদেশের উপকথা।' এই চিজ তো

দেখিনি আগে বাবুকাকার বইয়ের দোকানে। হাতে নিয়ে দেখতে সাহস হল না যদিও। সপ্তমীর বিকেলে ছোটকাকার শার্ট ধরে ঝুলে পড়লাম, ওই জিনিস আমার চাই, ওই লাল দোকানটায় আমায় নিয়ে যেতেই হবে, যে-তে-এ-এ-এ-ই হবে। 'ওখানে যাবি কি রে? ও তো পার্টির দোকান! তোর বাবা শুনলে আর আস্ত রাখবে না।' তখন ভ্যাঁ ছাড়া আমার আর কি করার থাকে বলুন? অতঃপর সজোরে চ্যাঁ এবং ভ্যাঁ। অতঃপর নবমীর দিন আমার হাতে সেই লাল-সবুজ-কালো মলাটের 'রুশদেশের উপকথা।' এ জিনিস সত্যিই টাটকা নতুন। এরকম তো পড়িনি কখনও আগে, পড়লামও না কোনদিন। সহজ সহজ লেখাগুলো, অদ্ভূত অদ্ভূত নাম। আর কি দারু-উ-উ-ণ ছবি।দুদিনে শেষ, আরো চাই, চাই চাই ব্যস। আর পাওয়া গেল না। কলেজ স্ট্রীটের নামই কেউ তোলে না আর, বাবুকাকাকে বলে বলেও আনে না। পরেরবার পুজোয় আবার লাল স্টল, এবার দাদুর দস্তানা আর সার্কাসের ছেলে। ওমা, কি আজব সব বই, রাশিয়া? কোন দেশ সেটা? কি ভালো ভালো সব লোকজন সেখানে, ঠিক আমার মত করে লিখতে পারে। প্রতিবার পুজোয় লাল স্টলের আমার সব 'মিষ্টি খেয়ো

হ্যাঁ?' বলে দেওয়া পয়সা উজাড় করে আসতাম। তারপর একদিন যখন পাড়াটা ছেড়ে চলে যাই, তখন বইগুলো যে কোথায় উধাও হয়ে গেল, কেউ খেয়াল করলো না।
আজ যখন জীবন আর আগের মত সহজ নেই, লাল স্টলগুলোতে আর আগের বইগুলো দেখি না, কলেজ স্ট্রীটেও অমিল, অনেকের মুখে শুনি, পড়ি, মিস করি সেই হারিয়ে যাওয়া বইগুলোর কথা, হঠাৎ দেখি একদল ভীষণ ভালো রুশ নয়, বাঙালীসন্তান যত্ন করে স্ক্যান করে ব্লগে আপলোড করছে সেই হারিয়ে যাওয়া বইগুলো। নাইবা পারলাম সেগুলো উপুড় হয়ে পড়তে, পাতার ভাঁজের গন্ধ নিতে, হলই বা একটু ঘাড় ব্যথা, কম্পিউটারের মারফত আমার চোখের সামনে হাজির আমার ছোটবেলার সোভিয়েত ইউনিয়ন, জ্যান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পুজোর লাল স্টল।
অতঃপর?
নস্ট্যালজিক হওয়া ছাড়া আমার আর কি করার থাকে বলুন?

অগাস্ট ১৭, ২০১৪

শহরের আনাচে কানাচে বা একেবারে প্রশস্ত রাস্তার পাশেই ইদানীং কিছু দেয়ালকে বেশ রং-চং দিয়ে রাতারাতি কুলীন করার প্রচলন উঠেছে (আহা, ঘাবড়াবেন না, এটি নব্য-বঙ্গীয় সংস্কৃতি স্বরূপ)। "গ্রাফিতি আর্ট" নামক এই হুজুগটির(?) জন্মদাতা পশ্চিমের দেশগুলিই। নামী স্কুলটির দেয়ালে গোল চশমা সহযোগে লেনন নামক এক বোকা লোকের বিশ্বশান্তির 'বাণী'(?), তার ঠিক নিচেই রোগা ছেঁড়া শাড়িতে বয়স্কা ভিক্ষুনী। আবার তার পাশ দিয়েই ৯৫ লাখী ফ্ল্যাটের উদ্দেশ্যে তারা ১৫লাখি গাড়িতে হুশ হুশ শব্দে চলে যাচ্ছে যারা ওই বাণীটি যত্ন করে লিখেছে। এটুকু পড়েই ভেবে ফেলবেন না বিরোধিতা আমাদের ধর্ম, এতে আমাদের নিয়োজিত প্রাণ (মনের উল্লেখ নাই বা করলাম)। বং খালি বাজে বকে (ঋণাত্মক, এই বদনাম আগেই পলান্ন সহ হজম) বলে নাক সিঁটকানোর আগে বলি, ধৈর্য ধরুন। বাংলাতে বছর দশেক আগেও দেয়ালের সর্বোচ্চ ব্যবহার হত গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের ঠিক মাস দুই আগের থেকে। কখন যে আপনার সাধের বাড়িটির

দেয়ালে আপনারই অপছন্দের প্রার্থীটির নাম থ্রিডি এফেক্ট সহ উজ্জল কমলা বা সবুজে (বোধ করি অন্ধকারেও ভালো দেখা যায়) ছাপিয়ে দিয়ে যাবে টেরটিও পাবেন না। বিনয়ের অবতার হয়ে আপনিও পরের বার হতে "দেয়াল-মকুবের" প্রস্তাব দেবেন, এবং সাড়া না পেলে বিনা ভাড়ায় আপনার দেয়াল বেগার খাটবে। এরপরেও নিস্তার নেই...কিডজি থেকে জিম্যাট হয়ে ডিকে লোধ ঘুরে "গাঁটের ব্যাথার" চিকিৎসা পর্যন্ত আপনার শৈশব থেকে বার্ধক্যে যাবার প্রতিটি মোড়ে বিজ্ঞাপনে মোড়া আপনার দেয়াল। "বিজ্ঞাপন মারিবেন না"-র পরেও ফুচুবাবুরা কি আপনার বাড়ি বাদ দেবেন নাকি? "টার্গেট" পূরণ না হলে মাসের বোনাস মার। অমনি চিহ্নিতকরণের জন্য (এ যেন বায়োলজির খাতা) রঙিন চকে আবার আপনার দেয়ালদের নীরব অশ্রুপাত। এ তো আর বিজ্ঞাপন নয়, হু হু বাওয়া আইন আছে, তার ফাঁদের সাথে সাথে ঘুঘুও আছে। তবে এ হতভাগ্য বঙ্গদেশে ১৯০৫ থেকেই 'দেয়ালের' অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে। চিংড়ি-ইলিশের চিরকালীন বিবাদ। "ওরা ঘটি, ওদের ঘুপচি চারটে দেয়াল" "ওরা বাঙাল রাস্তার ২ ফুট জায়গা নিয়ে দেয়াল তোলে"। তবে সব দেয়ালেরাই ইঁটের সন্তান, অলক্ষ্যে বাংলাভাষা

কেঁদে মরে (নইলে কি আর বাঙালীদেরই বোঝাতে হত “বাংলা তাদের ভাল ভাষা?”)। বহু আগে কোনো এক নাটকের শেষ দিনের শো টি দেখতে গিয়ে স্টেজের একেবারে মাঝে একটি জাঁদরেল দেয়াল দেখে ভারী অবাক হয়েছিলাম। দেয়ালের এধারে পালঙ্ক, তার পাশে রেকাবিতে আঙুর, ও পাশে মেঝেতে ছেঁড়া কাথা, ভাঙা জানালার শিক। এ বুঝি এই দেশেরই লোরেঞ্জ কার্ভের বাস্তবিক 'দেয়ালচিত' প্রয়োগ।
লোগো কার্টসিঃ এখানে বিজ্ঞাপন মারিবেন/ বেটস, কলকাতা।

অগাস্ট ২০, ২০১৪

শহরের নিয়নের বাতিগুলো জ্বলে ওঠার সাথে সাথেই আমার শহুরে মন হঠাৎ করে ছুটে চলে এক স্বপ্ন রাজ্যের দিকে, রবিবার হলে তো আস্তানা গেড়ে বসে পরে সেই মায়াবী আলয়ে। আজ ও সন্ধ্যের পর কিছু হাতে গোনা সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে ঢুঁ মারলাম সেই রাজ্যে, কফি শপ নামে যার পরিচিতি আমাদের শহুরে অভিধানে। হালকা এক মায়াবী আলো, নরম তালে বয়ে চলা এক সুর। নাহ, আমার ভারতবর্ষ এটা নয়, সারাদিনের ক্লান্তি এক লহমায় উধাও। শুধু কফি শপকেই বা ধরি কেন? সাথে আছে কিছু আন্তর্জাতিক দোকানও, যারা দাম দিয়ে আরাম ও ক্লান্তি ভোলায়। আড্ডা তক্ক গল্প ছেড়ে মন হয়ে ওঠে ফুরফুরে।... সে ছিল গোঁফের রেখা ওঠার সময়ের কথা, পকেটের ভাঁজে দশটাকা মানে বিশ্বকে কিনে ফেলার ক্ষমতা বলে জানতাম, স্কুল ছুটির পর সামনের বড় ঝোপটার আড়ালে গিয়ে ২ টান মেরে নিজেকে ঋত্বিক মনে করতাম। আজ অনেক দিন পর যেন নিজেকেই নিজের প্রশ্নের সামনে ফেললাম। জীবনটাকে কিনে বেচে নিজেকে পণ্য করে আজ কখন যেন হারিয়ে ফেলালাম নিজের অস্তিত্বটা। পকেটের পয়সার ঝনঝনানি আজ বড় মধুর লাগে, কফিশপের বাইরে অপেক্ষারত ছেড়া জামা প্যান্ট পড়া অভুক্ত ছেলেটি

আজ আমার মনে কবিতা জাগায়। ফেসবুকে সেই কবিতা ছেপে নিজের কলার তুলে বাহবা কুড়োই। আজ যে আমি বড়ই আন্তর্জাতিক (হয়ত আত্মঘাতী), পাড়ার দোকানের ঝালমুড়ির স্বাদ মুছে ফেলতে পেরেছি নিজের স্মৃতি থেকে। ৫০০ টাকা খরচ করে ৩ জনের আয়েস আজ জলজ্যান্ত আনন্দ দেয়। রাতের দিকে বাড়ি ফেরা মন দোকান থেকে বেড়িয়ে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটা ও তার মায়ের দিকে ছুড়ে দায় একটা ৫ টাকার ছেঁড়া নোট (যাকগে, বাস এ তো আর চালাতে পারতাম না)। তাড়াতাড়ি ছুটে চলা অটোটা ধরতে হবে, রাতের দিকে কফি শপের নিস্পাপ আনন্দের ছবি গুলো শেয়ার না করলে মনের খচখচানিটা ঠিক যাবে না। আর কবিতাটা? ফেসবুক বলছে দশটা লাইক ইতিমধ্যেই তুলে নিতে পেরেছি, দশজনের মধ্যে সেই মেয়েটিও আছে। আজ রাতের ঘুমটা ভালই হবে তার কথা ভেবে। ...আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে...

অগাস্ট ২১, ২০১৪

খড়দা থেকে ট্রেনটা ছাড়ার কিছুক্ষণ পরেই কামরার আলোগুলো হঠাৎ নিভে যায়। জুবসি অন্ধকারে বাইরে তাকালেই দেখা যায়, সার বেঁধে কিছু ঘুপচি পায়রার খোপের মত টালির ঘর। মাঝে একটা ঝিল, এদিক ওদিক দেবদারু গাছ, সোলার প্যানেলের আলো। সদ্য রঙ করা গেটের সাইনবোর্ড কামরা থেকেই দেখা যায়, এর পোশাকি নাম 'গান্ধী প্রেম নিবাস।' কুষ্ঠরোগীদের জন্য একটি অবৈতনিক রিহ্যাব, মাদার টেরেসার তৈরী। এই 'প্রেম নিবাসের' কথা ভেবে সবে যখন চক্ষু ঢুলুঢুলু, চোখ তুলে একটু ঘরগুলোর পিছনে তাকানো জরুরী, খুব সহজেই দৃশ্যমান কয়েকটি প্রকাণ্ড ঢিবি, প্রাকৃতিক নয়, 'কৃত্রিম', অর্থাৎ ঢিবিগুলো যতরাজ্যের জঞ্জালের তৈরী। ওয়াল-ই সিনেমার প্রথম দৃশ্যটা দেখা থাকলে আর বিশেষ কল্পনার প্রয়োজন পড়বার কথা নয়। আকাশে পাক খাচ্ছে চিল। বিদ্যুতের খুঁটির ওপর বসে আছে দুটো শকুন। কুষ্ঠ রিহ্যাবের সংলগ্ন ওটাই এতদঅঞ্চলের সবচেয়ে বড় 'ধাপার মাঠ', লোকমুখে 'ভাগাড়'।

ততক্ষণে কামরায় জ্বলে উঠেছে আলো। পরবর্তী স্টেশন টিটাগড়, প্ল্যাটফর্ম বাঁ দিকে। রোজকার যাতায়াতের সুবাদে দৃশ্যটা প্রায় সব নিত্যযাত্রীর মুখস্ত, দুর্গন্ধে নাক সিঁটকোতে আর বিশেষ তাকানো হয় না ওদিকে। সেদিন কি কারণে হঠাৎ নজর করাতে চোখে পড়লো এক অচেনা দৃশ্য। বর্ষার ভরসায় দীর্ঘকাল জমে থাকা পচা সবজি, মৃত জীবজন্তু ময়লা প্লাস্টিকের পাহাড় ঠেলে বেরিয়ে এসেছে বুনো ঘাসের চারা। বেঁচে থাকার জেহাদে ঢেকে দিচ্ছে জঞ্জালের স্তূপ। মাটিহীন জলহীন ফ্যাকাশে ধূসর ঢিবিতে তখন সবুজের বিদ্রোহ, ঠিক যেন রুগ্ন শিশু প্রথমবার দোল খাচ্ছে বটের ঝুরিতে, অসহায় কুষ্ঠরোগীর আস্তাকুঁড় থেকে জন্ম নিচ্ছে বেঁচে থাকার নেশা।

আলো জ্বলে ওঠে কামরায়।

আমার ব্যস্তবাগীশ শহর বহুকাল পর একবার প্রাণ ভরে প্রশ্বাস নেয়।

অগাস্ট ২১, ২০১৪

আমার দাদুর মাথায় কিঞ্চিৎ ছিট ছিল। গামছা পরে সারা গায়ে তেল মেখে রোদ পোয়ানোর পর যখন তাঁর স্নানের সময় হত, তিনি সারা উঠান মায় রাস্তা পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে বালতি হাতে স্নান করতেন। তাঁর দাবী ছিল, ওতে নাকি ঘর ঠান্ডা হবে।

কয়েকদিন যাবৎ ফেসবুক আমার স্বর্গত ছিটগ্রস্ত দাদুর কথা বারবার মনে করাচ্ছে। প্রথমে বিদেশী তারপর দেশী ছেলিব্রিটিগণ যখন তখন মাথায় বরফ পানি ঢেলে বেড়াচ্ছেন এবং আপলোড করছেন। এই কিম্ভূত অভ্যেসের নাম ইতিমধ্যে সবাই জেনে গেছেন, ALS আইস বাকেট চ্যালেঞ্জ। উইকি ঘেঁটে জানা গেলো, ALS হচ্ছে একটি নিউরোনঘটিত রোগ যার ফলে শরীরের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধীরে ধীরে বিকল হয়ে যেতে থাকে, স্টিফেন হকিং সহ এ রোগে আক্রান্তের সংখ্যা নেহাত কম নয়।

আর মাথায় জল ঢালার সঙ্গে তার সম্পর্ক এককালে ছিল বৈকি। কথা অনুযায়ী, এই এক বালতি জল ঢেলে আপলোড করলে আপনার ALS রোগীদের সাহায্যার্থে ১০ ডলার

দেওয়া দস্তুর, আর না পারলে ১০০ ডলার দেওয়া জরিমানা।
কিন্তু এ হল গিয়ে পরোক্ষ কারণ। নিউ ইয়র্ক থেকে এদেশে আসতে গিয়ে ডোনেশনের গল্পটি মাঠে মারা গিয়েছে, এখন আসলি কথা হল মজা। অলোক নাথ, আলিয়া ভাট, ট্রল কমিক, সেলফি সব মজাই প্রায় ভাঁটার টানে, এখন ব্যস্ত থাকার জন্য কিছু একটা চাই তো। তাই ডোনেশন দিন বা না দিন, হলিউড বলিউড সব্বার জাতীয় সঙ্গীত এখন ঠাণ্ডে ঠাণ্ডে পানি মে নাহানা চাহিয়ে। আমি ঢালছি, তো তুইও ঢাল। আমার ছিটগ্রস্ত দাদুর মত তাদেরও অবাক দাবী, জল ঢাললেই বুঝি ALS রোগীরা চটপট হুইলচেয়ার ছেড়ে উঠে বসবেন। আশা করা যায়, ছেলিব্রিটি শ্রেণীশত্রুর বাধা পেরিয়ে হরিদাস 'খটমট-মিডলনেম' পালরাও শিগগিরি উদ্যোগী হবেন জল ঢালতে, ক্যামেরা ফোন রয়েছে কি করতে! দ্যাখ বে, আম্মোও বিল গেটস।
হে আদেখলা বং-বৃন্দ, ভেজা জামার হিরো-হিরোইনদের ভিডিও দেখে তুমুল আত্মমৈথুনের সময় জলভর্তি বালতি আপনাদের মাথায় পড়ুক, যাতে খেয়াল হয় আপনি জল ঢাললে, কিংবা তাতে একশো লাইক, শেয়ার পড়লেও কেউ একটি পয়সাও দেবে

না পাড়ার মোড়ের প্যারালিসিস রোগীটিকে। গুচ্ছের মানুষকে ট্যাগ না করে, দুনিয়ার সামনে ভুঁড়ি না দুলিয়েও যে সমাজসেবা সম্ভব, সে কথা মনে পড়ুক। বিল গেটস না হয় আফ্রিকায় গিয়ে আয়ের বেশ খানিকটা অংশ খরচে এসেছেন, আপনি কোন মহামানব শুনি?

বিঃ দ্রঃ রামপ্রসাদের বিখ্যাত গান 'ডুব দে রে মন কালী বলে'-র জম্পেশ প্যারডি করেছিলেন আরেক পল্লীকবি আজু গোঁসাই, সেই গানের প্রথম চার লাইন ছিল-

'ডুবিস নে মন ঘড়ি ঘড়ি
দম আটকে যাবে তাড়াতাড়ি।
একে তোমার কফোনাড়ী,
যেতে হবে যমের বাড়ি।'

আহা, নাজুক, নাজুক!

অগাস্ট ২৩, ২০১৪

আমাদের ব্লগের জন্য সৌপর্ণ অধিকারীর দ্বিতীয় লেখা ,পাঠক চেটেপুটে সাফ করেন। অতএব, কত্তারা, একটু পুরনো হয়ে যাচ্ছি... ওই ভদ্র-মার্জিত ভাষায় যাকে বলে রিডানড্যান্ট...

মার্কিন মুলুকে আসার পর থেকে চুলকে চুলকে মাথার ব্রহ্মতালুতে টাক পড়ে যাবার অবস্থা হয়েছে... কলকাতার যে পত্রিকাটি "না পড়লে পিছিয়ে পড়তে হয়" (নাকি পড়তে হয় না, পড়লে পিছিয়ে পড়তে হয়?) এবং যাঁরা মোটামুটি ম্যাকবেথ থেকে মাইটোকন্ড্রিয়া হয়ে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ (বিশেষ্ + অজ্ঞ?) পাতার পর পাতা আদিমকালে সাদা-কালো, বর্তমানে পকেট মেরে CMYK রঙিন কালিতে ছাপিয়ে যাচ্ছেন মার্কিন মুলুকে মানুষ কত সুখে থাকে বোঝাতে, তাদের বিরুদ্ধে মামলা করবো ভাবছি... মাথা চুলকে চুলকে ছাপার অক্ষর আর বাস্তব মেলাতে গিয়ে অ্যালোপেশিয়ার মত হয়ে যাবার দশা... মাথার চুলের ইন্স্যুরেন্সের খরচটা ওনাদেরই দেওয়া উচিত...

ইলেকট্রিক কোম্পানির কাছে আবেদন করা হয়েছিল নতুন বিদ্যুতের সংযোগের জন্য... কাল ল্যাব থেকে বাড়ি ফিরে আবিষ্কৃত হল, মাননীয় বিদ্যুৎ কোম্পানির সু"দক্ষ" মার্কিন

কর্মচারী কানেকশনটি কেটে দিয়ে টাকা না দেবার অজুহাতে (নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ, খেয়াল রাখবেন) সিল করে দিয়ে গেছেন মিটার বাক্স... ব্রহ্মতালুতে বজ্রাঘাত...
তৎক্ষণাৎ ফোন করা হল বিদ্যুৎ দপ্তরে... মোটামুটি বার ৪-৫ ফোন করার পর তাঁরা দয়া করে ফোন ধরলেন... আরো মিনিট ১৫ ফোন ধরে এই টেবিল, ওই টেবিল হবার পর তাঁরা এবং আমরা দুপক্ষেই বুঝলাম বিষয়টা একটা "ছোট্ট ঘটনা", "ভুল করে করে ফেলেছে..."
আরো মিনিট ২০-২৫ ফোন ধরে থাকার পর তাঁরা বাড়ি এসে ঠিক করে দেবার অভয়বাণী দিয়ে কেতাত্থ করলেন...
ওই দেখছেন?!!! পুরনো হয়ে যাচ্ছি তো ধরাধামে, আজে-বাজে বকে ফেলি...
তো যা বলছিলাম, মাথার চুলের ইন্স্যুরেন্স... কয়েকদিন আগে, অ্যাপলইয়ার্ড রোড যেখানে টেনিসী স্ট্রিটের সাথে মিশেছে, সেখানে রাস্তার ধারে বাস-স্ট্যান্ডে বাস থেকেই দেখলাম হাতে নোংরা থলে নিয়ে, শতছিন্ন পোশাকে এক শ্বেতাঙ্গ মাঝবয়সীকে বসে থাকতে... মুখে সাদা-দাড়ি-গোঁফে উকুনের পরিপাটি সংসার হলে আশ্চর্যের কিছু নেই...

মাথায় একটা নোংরা পুঁজ লাগা ব্যান্ডেজ...
প্রাণের দাম ঠিক করে দেয় হেলথ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি... পকেটে ফুটো আর জীবনের দাম ফুটো পয়সার থেকে কম হয়ে যাওয়া খানিকটা একই ব্যাপার...
এরপরও পড়তে হবে প্রথম বিশ্বের বুলি, এরপরেও মাথা নিচু করে নব্য-দাসত্ব...
পুনশ্চঃ ভদ্রলোকের পাশের কার্ডবোর্ডে লেখা ছিল... "গৃহহীন... আশ্রয়প্রার্থী..."... ইনিও কিন্তু প্রথম বিশ্বের নাগরিক...
- অধিকারীর পো

অগাস্ট ২৭, ২০১৪

এস এন ব্যানার্জী রোডের জ্যামে দাঁড়িয়ে আছে নতুন শেভ্রোলে স্পার্ক। ইঞ্জিন চলছে, তুমুল হর্ণাহর্ণি। হঠাৎ জানলার কাঁচে টোকা শুনে চালক মুখ ফিরিয়ে তাকায়। বাইরে একটি স্কুলড্রেস পরা ছেলে, বয়স বড়জোর বারো-তেরো। খানিকটা অবাক হয়েই কাঁচটা নামাবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি একটি লিফলেট গলিয়ে দেয় গাড়ির ভিতরে। অনভ্যস্ত গলায় বলে, 'কাকু, হর্ণ বাজিও না, সামনে হাসপাতাল।' বলেই ছুট লাগায় সামনের গাড়িতে। চালক দেখতে পায় তার গলায় ঝুলছে মস্ত প্ল্যাকার্ড, তার ওপর লেখা ট্রাফিক পুলিশের জিংগল। পরণে হাফপ্যান্ট, চেহারায় অভাবের ছাপ। হয়তো দশ টাকা পাবার আশায় এই সমাজ কল্যাণ। মাথা নিচু করে ইঞ্জিন বন্ধ করে দেয় চালক, হাত সরিয়ে নেয় হর্ণের থেকে, যত্ন করে বেঁধে নেয় 'অপ্রয়োজনীয়' সিটবেল্টটা। নাঃ, লিফলেটটা পড়ার প্রয়োজন নেই তার। খিস্তিধারী গ্রীন পুলিশ আর কেসউদ্যত সার্জেন্টের রোয়াব মানতে ইচ্ছে করে না একদম, কিন্তু এই হাফপ্যান্টের অনুরোধ সে ফেলবে কিভাবে?

অগাস্ট ২৯, ২০১৪

অতএব শুরু করে দিলাম আজ থেকে ওঠা- বসা। চেয়ার থেকে নয় অবশ্য, ইংরিজিতে যাকে বলে জিম, সেখানেই। আজ গণেশ চতুর্থী, হাতে পরে রইলো আর এক মাস, তার পরেই আর আমাকে পায় কোথায়... পুজোর আমেজ, শুরু হয়ে গেল আজই। আমার ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে বেড়ে চলা ভুঁড়ির দায়িত্ব আমি আর নিতে রাজি নই, পুজোর আগে যে করেই হোক করব নিজেকে Slim অ্যান্ড Trim...। পুজো মানেই হল আমার পুজো, সেখানে আমি, আমার বন্ধু, আর সে... আর কেউ না। ঘটনা চক্রে সেদিন অফিসে এক অন্য ছবির সামনে এসে পরলাম। হ্যাঁ কোলকাতারই অফিস, আমাদের চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন আছে বৈকি। আজ আমাদের "লাখ লাখ ভাইটি করে খাচ্ছে আই.টি", কিন্তু আমাদের এই লাখ লাখ ভাইদের খাওয়াচ্ছে আরও কিছু ভাইটি, যারা এসেছেন তথাকথিত শহুরের জীবনের বাইরে থেকে, যাদের Escalation বলতে চাকরি থেকে ছাঁটাই বোঝায়। ফিটফাট বাবুটি সেজে ঢুকি আমি হিমঘরে, কোড লিখতে, মাথায় ঘোরে পাশে বসা মধুছন্দার জন্মদিনের পার্টি। দুপুরে সবান্ধব চলে আসি ক্যান্টিনে, বহুজাতিক অফিসের ক্যান্টিন,

ব্যাপারই আলাদা। প্লেট এ সুখাদ্য গুছিয়ে দেওয়া ছেলেটির দিকে ভুল করেও দিইনা সহানুভূতির দৃষ্টি। রোজই তো যান সেই একই ক্যান্টিনে, খোঁজ নিয়েছেন কোনদিন এই ছেলেগুলোর সম্বন্ধে? হয়ত নেবেনও না কোনদিন... শুনুন তাহলে, সবার আগে খোঁজ নিন এদের কাজের সময়গুলো। সপ্তাহে এক দিন ছুটি, তারও কোন নিশ্চয়তা কিছু ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না, ১২ ঘণ্টার শিফটে কাজ করেন এরা, স্বাধীনতা দিবস, দুর্গা পুজো, কোন কিছুতেই আলাদা কোন বোনাস নেই। সকাল সাতটায় ঢুকে পরতে হয় অফিসের ক্যান্টিনে, ছুটি সন্ধ্যে সাতটার পর। পরের শিফট শুরু হয় সন্ধ্যে সাতটায়, চলে সকাল সাতটা অবধি। কোন দিন অফিসে আসতে দেরী হলে? থাক সেটা আর বললাম না... আপনি নিজেই তো জানেন কি রকম মেজাজটা হয় যদি ক্যান্টিনে গিয়ে কোনদিন খাবারের প্লেট পেতে দেরী হয় তবে, যা বলার ওই মুহূর্তেই মুখ ফসকে...। না ভাববেন না অশিক্ষিত বলে এটা এদের কর্তব্য, খোঁজ নিয়ে জানুন, দেখবেন এদের মদ্ধেই পেয়ে যাবেন কিছু Honors এর ছাত্রকে। পেট চালানোর জন্য আপনাদের অন্ন দেওয়ার কাজটা বেশ ভালই রপ্ত করেছে... আজ এই ২১ শতকেও ভারতবর্ষের বুকে দাসত্ব চলে, আর

চলছে এই সব আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর অন্দরেই, মাইনে নিয়ে ভাববেন না। নিরাশ হবেন শুনলে। আমরা আজ বড়ই স্বার্থপর, মিটিং মিছিলে যাই না। সেটা না হয় ভাল কথা, কিন্তু নিজেদের চোখের সামনে লাঞ্ছিত হতে দেখলেও আমরা মুখ বন্ধ করে রাখি। সামনেই পুজো, চেষ্টা করুন না, যদি এদের মধ্যে কোন এক জনের মুখে সামান্য হাসিটা ফিরিয়ে দিতে পারেন, কত কিছুই তো করি আমরা সারাদিন, এদের জন্য কি একটুও সময় বের করতে পারব না?

পুনশ্চঃ আমি কিন্তু কোন প্রতিবাদ গড়ে তুলতে পারিনি, আমার সহকর্মীরা আমায় পাগল বলে তাড়িয়ে দিয়েছে।। ভরসা রাখছি আপনাদের ওপর।